أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾
يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ
آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

(৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্‌কে অপারগ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৪৫) যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌র সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

সূরা ইয়াসীন

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, يس قلب القران অর্থাৎ, সূরা ইয়াসীন কোরআনের হৃদপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফেরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর। — (রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কেয়ামত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রূহুল-মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম "আযীমা"ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম "মুয়িম্মাহ্" বলে উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম "শরীফ" বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ "রবীয়া" গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম "মুদাফিয়াও" বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম "কাযিয়া" - ও উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ, এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়। — (রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মরন্মোমুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। — (মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে, তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। —(মাযহারী)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। — (মাযহারী)

يٰسٓ শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহ্কামুল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ "হে মানুষ" আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়েরের (রাঃ) বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, "ইয়াসীন" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম। রূহুল-মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন — এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ ? ইমাম মালেক এটা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর মতে এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই। কাজেই এর অর্থ خالق ও رازق এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি ياسين বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েয। কারণ, কোরআনে سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ উল্লেখিত আছে। (ইবনে আরাবী)

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ – অর্থাৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেননি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তবে দ্বীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের আয়াতেও আছে। এছাড়া وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহ্র রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াত ও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর এ কারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

আল্লাহ্ তাআলা কুফর ও ঈমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্যে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্যে কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ লোকের জন্যে তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

অতঃপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে — নীচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ এমন— যেন কারও চারিদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফেরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌঁছতেই পারে না।

ইমাম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফেরদের জন্যে সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নীচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পায় না।— (রূহুল-মা'আনী)

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠
اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝١١ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ
اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ
جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٣ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝١٤ قَالُوْا
مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝١٥ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُوْنَ ۝١٦ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٧ قَالُوْٓا
اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ
مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٨ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۗ اَئِنْ
ذُكِّرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝١٩ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا
الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ۝٢٠
اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٢١

(১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'য়েই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। (১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদেগার জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায় বৈ নও। (২০) অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ – অর্থাৎ, আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে 'পূর্বাহ্নে প্রেরণ করা' বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌঁছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুল-ভ্রান্তির ও কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয় ঃ وَاٰثَارَهُمْ অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। اثار এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণতঃ কেউ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্দ্বারা মানুষের দ্বীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল— তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়— কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে,তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব—অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহ্‌ও তার আমলনামায় লিখিত হবে— অথচ পালনকারীদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবেনা।—(ইবনে-কাসীর)

اثار শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাযের জন্যে মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে اثار বলে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নবভী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশী হবে, তোমাদের সওয়াব তত বেশী হবে। ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কিত

রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লেখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জওয়াব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাংককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়।— (ইবনে-কাসীর)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ – কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্যে অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ... বলা হয়। পূর্বোল্লেখিত কাফেরদেরকে হুশিয়ার করার উদ্দেশে কোরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লেখিত জনপদ কোন্‌টি? কোরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবু হাইয়্যান ও ইবনে-কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোন উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রাচীন নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খ্রীষ্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল-জাররাহ্ (রাঃ) এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর যেয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত জনপদ হচ্ছে— এই ইন্তাকিয়া নগরী। তবে এখানে কোন নগরী নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই।

إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ বর্ণিত জনপদে তিন জন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশে তৃতীয় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। অতঃপর রসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদ-বাসীদেরকে বললেন, إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (আমরা অবশ্যই তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছি)।

এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কোরআন পাকে সাধারণতঃ নবী ও পয়গম্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রসূলের অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে-ইসহাক, হযরত ইবনে-আব্বাস, কা'বে আহ্‌বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিন জনই আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদূক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।— (ইবনে-কাসীর)

قَالُوْٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ - تطير শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা আমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোন কষ্ট -দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়েতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে।

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ – অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ, এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। طائر শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য।— (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী)

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى — প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قرية শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ; তা— ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مدينة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোন বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ অর্থ এই যে, শহরের কোন একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رَجُلٌ يَّسْعٰى এতে يَّسْعٰى শব্দটি سعى থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল।

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾
ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي
شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ
ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ
أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى
الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟
كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن
كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ
أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ
مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا۟ مِن
ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَٰنَ الَّذِي خَلَقَ
الْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾
وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

(২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত – (২৭) যে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (২৮) তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুতঃ এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্যে আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্রূপ করে না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। (৩৩) তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। (৩৫) যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (৩৬) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা ঃ কোরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইস্হাক হযরত ইবনে-আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাজ্জার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মো'জেযা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় এবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও রসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাবে নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেন, إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ – অর্থাৎ, আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম—তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশেও হতে পারে এবং এতে 'তোমাদের পালনকর্তা' বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশেও হতে পারে এবং فَاسْمَعُونِ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহ্র সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ — অর্থাৎ, উপদেশ দানের উদ্দেশে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হল; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যতঃ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেয়া যে, জান্নাত তোমার জন্যে অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ, হাশর-নশরের পর তুমি তা লাভ করবে। —(কুরতুবী)

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ, কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েশের উপকরণ পৌঁছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌঁছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।—(বোখারী)

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্বরের বেলায়

এমন হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবী যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা নির্দশন আছে কি? তাঁরা হাঁ বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রসূলগণ বললেন, হাঁ; আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেব-দেবীদের কাছে দোয়া করছি; কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদেগার একদিনে কিরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ তাঁর জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি رب اهد قومى (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন।

يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ

— হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নেয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবতঃ তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও সংস্কার ঃ প্রেরিত রসূলত্রয় মুশরেক ও কাফেরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্যে চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরেকরা তিনটি কথা বলেছে ঃ

(১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

(২) করুণাময় আল্লাহ্ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাযিল করেননি।

(৩) তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন, رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা, জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহ্‌র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উস্কানিমূলক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন।

এরপর মুশরেকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জওয়াব ছিল এই ঃ অলক্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তাঁরা বললেন, طَٰٓئِرُكُمْ مَّعَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গলই তোমাদের সাথে রয়েছে। অতঃপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন, أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা চিন্তা কর, আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই ঃ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ, তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নওমুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথম দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রসূলগণের কথা মেনে নেয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূর-দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্যে এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হেদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহ্‌র কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ — অর্থাৎ, এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্যে উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি

বদদোয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই পয়গম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ক্ষোভ মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশী জেদ ও হঠকারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ..... فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আযাব দেয়ার জন্যে আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্যে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিব্রাঈল আমীন শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন خَامِدُونَ শব্দে ব্যক্ত করেছে। خامد এর অর্থ আগুন নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু।

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমন ধরনের নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সবসময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফল-মূল জন্মায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্যে ভূ-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ – অর্থাৎ, বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করতে পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্যে সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই ঃ বলা হয়েছে وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল তৈরী করেনি। এ বাক্যটি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর, এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে, তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা— এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাআলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের বিশেষ পার্থক্য ঃ ইবনে জরীর প্রমুখ তফসীরবিদ وَمَا عَمِلَتْهُ বাক্যের ما কে موصول এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফল-মূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরী করে। উদাহরণতঃ ফল-মূল দিয়ে নানারকম হালুয়া,আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরী করা হয়। সারকথা এই যে, ফল-মূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার সুযোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরী করার নৈপুণ্যও আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নেয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরীর নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়াও একটি নেয়ামত। এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত মাসউদের এক কেরাত দ্বারাও এই তফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে ما শব্দের পরিবর্তে وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ রয়েছে।

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ — এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। نَسْلَخُ এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্ তাআলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

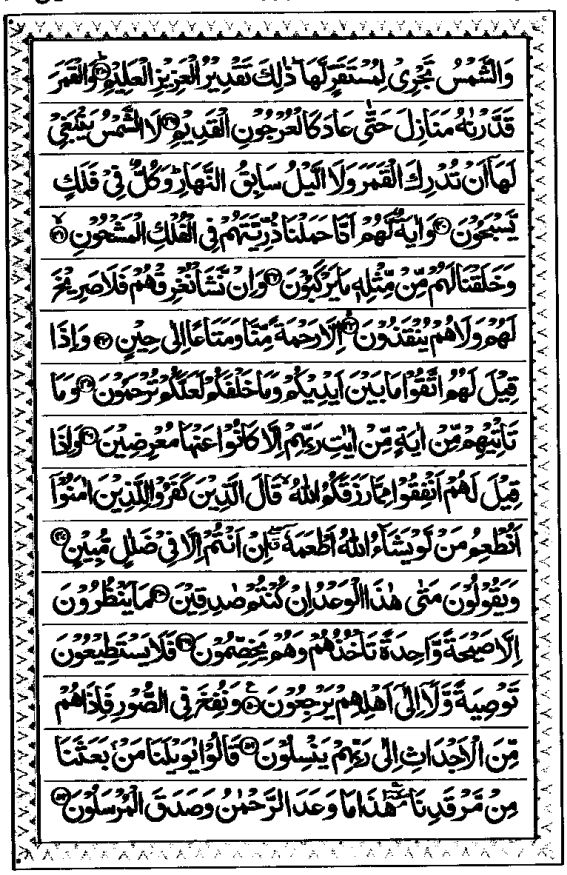

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٣٨ وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ
لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ
يَّسْبَحُوْنَ ۝٤٠ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝٤١
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝٤٢ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝٤٣ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝٤٤ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝٤٥ وَمَا
تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝٤٦ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٤٧
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤٨ مَا يَنْظُرُوْنَ
اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝٤٩ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٥٠ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ
مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۝٥١ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا
مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۝٥٢

(৩৮) সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৪০) সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪১) তাদের জন্যে একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্যে নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেয়ার কারণে তা করি না। (৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের আযাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মুমিনগণকে বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব ? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ। (৪৮) তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়ত করতেও সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। (৫১) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৫২) তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ। কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ, সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল ও স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। مستقر শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়। — (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কেয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌঁছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে। — (ইবনে-কাসীর)

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন।

আবু যর গেফারী (রাঃ) একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবু যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আয়াতে مستقر বলে তাই বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, প্রত্যেক সূর্য আরশের নীচে পৌঁছে সেজদা করে এবং নূতন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্গার, কাফের ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। — (ইবনে কাসীর)

নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কেবলার দিক নির্ধারণ, বছর, মাস ও দিন তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্ক শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্ব ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ, আপনি উত্তরে বলুন, চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও দিন-তারিখ জেনে হজ্বের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ

রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ অতঃপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন, اَحْيَيْنٰهَا এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ – عرجون অর্থ শুষ্ক খেজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। منزل শব্দটি مَنَازِلَ এর বহুবচন। অর্থ অবতরণস্থল। আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্যে বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মনযিল' বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল ঃ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হত। কোরআন পাক এসব পারিভাষিক নামের উর্ধ্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূরা ইউনুসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের আয়াত এই ঃ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুস চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী "শুষ্ক খর্জুর শাখার মত" বলে এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ — অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। فَلَكٍ শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। বাৎলীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নীচে এক বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ — এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে দেয়। বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তান-সন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সন্তান-সন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষতঃ যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রও এসব নৌকা বহন করে। وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্যে কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তূপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سفينة البر অর্থাৎ, স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ ঃ কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমনসব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানতঃ উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানির উপর সন্তরণ করে পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস তাকে নীচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলোচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা কিংবা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের দুটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদের বলে, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। তোমরা এ শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে

তা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পরোক্ষভাবে রিযিক প্রাপ্তির রহস্য ঃ দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা গরীব মিসকীনকে সাহায্য করার জন্যে এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্যদানের জন্যে কাফেরদেরকে বলত যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাব গ্রস্তদেরকেও দান কর। এর জওয়াবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তেমরাই বল যে, সকলের রিযিকদাতা আল্লাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। কেননা. তোমরা আমাদেরকে রিযিকদাতা বানাতে চাও। বলাবাহুল্য, কাফেররাও আল্লাহ্ তাআলাকে রিযিকদাতা বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

অর্থাৎ, আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অত:পর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম ফল-মূল উদগত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাআলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ্ তাআলাকেই রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু মুসলমানদের জওয়াবে ঠাট্টার ছলে উপরোক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য করাকে আল্লাহ্র রিযিকদাতা হওয়ার পরিপন্থী মনে করত। রিযিকদাতা আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময় আইন এই যে. তিনি একজনকে দান করে অন্যজনকে দেয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেন। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিযিক দিতেও সক্ষম জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেন। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে রিযিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা সওয়াব পায় এবং গ্রহিতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত এই ভিত্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার মুক্ষাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও কোন ঋণ নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফেররা তো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং ফেকাহবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুঁটিনাটি বিধানাবলী পালনে আদিষ্টও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিসের ভিত্তিতে কাফেরদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোন শরীয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশে নয়; বরং মানবিক সহমর্মিতা দায়িত্ববোধের প্রচলিত নীতির ভিত্তিতে ছিল।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً কাফেররা যে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ বলে ঠাট্টা ও পরিহাসচ্ছলে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কেয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন্ বছর ও কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে? বর্ণিত আয়াতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জানার জন্যে নয়; বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিল। জানার জন্যে হলেও কেয়ামতের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেয়াই খোদায়ী রহস্যের দাবী ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রসূলকেও দান করেননি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে কেয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবী, কিন্তু তারা এমনি গাফেল যে, কেয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে যে, তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কেয়ামত হবে একটি মাত্র মহানাদ যা তাদেরকে তখন অতর্কিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেন-দেনের বাক-বিতণ্ডায় ব্যস্ত থাকবে। সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ, তখন যারা একত্রিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাজের ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না। আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

এরপর বলা হয়েছে, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ – أجداث শব্দটি جدث এর বহুবচন। অর্থ কবর। يَنْسِلُونَ শব্দটি نسلان থেকে উদ্ভূত। অর্থ দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا অর্থাৎ, তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ অর্থাৎ, হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়তে দৌড়তে উপস্থিত হবে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا কাফেররা কবরেও আরামে ছিল না, বরং আযাবে পতিত ছিল। কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় সে আযাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মুমিনগণ এর জওয়াবে বলবে ঃ

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ অর্থাৎ, করুণাময় আল্লাহ্ যে কেয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কেয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রূক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহ্র 'রহমান' গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতেই তোমাদের জন্যে এ আযাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেয়া এবং কিতাব ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আল্লাহ্র 'রহমান' গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ছিল।

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ۝٥٣
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ۝٥٤ إن
أصحب الجنة اليوم في شغل فكهون ۝٥٥ هم وأزواجهم في ظلل
على الأرائك متكئون ۝٥٦ لهم فيها فكهة ولهم ما يدعون ۝٥٧
سلم قولا من رب رحيم ۝٥٨ وامتزوا اليوم أيها المجرمون ۝٥٩
ألم أعهد إليكم يبني ءادم أن لا تعبدوا الشيطن إنه لكم عدو
مبين ۝٦٠ وأن اعبدوني هذا صرط مستقيم ۝٦١ ولقد أضل
منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ۝٦٢ هذه جهنم التي
كنتم توعدون ۝٦٣ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ۝٦٤ اليوم
نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
يكسبون ۝٦٥ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصرط فأنى
يبصرون ۝٦٦ ولو نشاء لمسخنهم على مكانتهم فما استطعوا
مضيا ولا يرجعون ۝٦٧ ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا
يعقلون ۝٦٨ وما علمنه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرءان
مبين ۝٦٩ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكفرين ۝٧٠

(৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (৫৫) এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। (৫৮) করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (৬১) এবং আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। (৭০) যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إن أصحب الجنة اليوم في شغل فكهون জাহান্নামীদের দুরবস্থা বর্ণনা করার পর কেয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। فكهون এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল ঃ في شغل এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে।

এ স্থলে في شغل সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জান্নাতে ফরয-ওয়াজিব কোন এবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

هم وأزواجهم – أزواج শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

ولهم ما يدعون শব্দটি دعوة থেকে উদ্ভূত। অর্থ আহবান করা। অর্থাৎ, জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেত্রে يسئلون বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وامتزوا اليوم أيها المجرمون হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে – كأنهم جراد منتشر অর্থাৎ, তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফের, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وإذا النفوس زوجت অর্থাৎ, যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে।

ألم أعهد إليكم يبني ءادم أن لا تعبدوا الشيطن অর্থাৎ, সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কেয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের এবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণতঃ শয়তানের এবাদত করত না, বরং দেব-দেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের এবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই এবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের এবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে এমনসব কাজ করে, যদ্দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমনসব কাজ করে যদ্দ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

اليوم نختم على أفوههم হাশরে হিসাব- নিকাশের জন্যে

উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ,চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখ রয়েছে।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ – تعمير শব্দটি نعمر থেকে উদ্ভূত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা। تنكيس শব্দটি ننكس থেকে উদগত। অর্থ উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিষ্প্রাণ ফোটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবী করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাস প্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়,এখানে পৌঁছে সে আবার সে স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌঁছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টি শক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্ তাআলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত নেয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেয়া বাহ্যতঃ সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যেও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমানুয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ নবুওয়ত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ, এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কালাম হওয়ার কারণে নয়,বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা যায় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কবি বলেছে? কারণ, কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -কে কবি বলার পেছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি। ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কখনও কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণতঃ করতেন না; তবে ইবনে-তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন।

পংক্তিটি এই ঃ

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالاخبار من لم تزود

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, من لم تزود بالاخبار আবৃত্তি করলে হযরত আবুবকর (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে

প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্যে শোভনীয় মনে করতেন না।